পাঠাগার কোথায়, কীভাবে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পাঠাগারে জ্ঞান থাকে, অনেক কালের জ্ঞান যেন নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে পাঠকের জন্য। ছোটো গৃহে বিরাট আয়োজন।
জ্ঞান জিনিসটা মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। আহার, বাসস্থান, জামাকাপড়, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা খুব বড়; তাই বলে জ্ঞানের চাহিদাটাও নিতান্ত কম নয়। জ্ঞান না থাকলে তো মানুষ মানুষই থাকে না, আর পাঁচটা প্রাণীর একটিতে পরিণত হয়।

জ্ঞান বই থেকে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জীবন থেকেও। বইয়ের যে জ্ঞান সেটাও জীবন থেকেই উঠে আসে; এসে সংরক্ষিত থাকে, পড়বে যে তার জন্য। জ্ঞান পাওয়া যায় বিদ্যালয়েও। ভালোভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের জ্ঞানপ্রাপ্তির পেছনে একটা প্রাতিষ্ঠানিকতা থাকে, থাকে আনুষ্ঠানিকতা। তাগাদা থাকে পরীক্ষা দেবার, তাগিদ থাকে সনদপ্রাপ্তির। পাঠাগারে সেসব কিছু নেই। সেখানকার জ্ঞানানুশীলন সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক; সেজন্য মুক্ত ও আনন্দমুখর। তবে পাঠাগার যে বিদ্যালয়ের বিকল্প তা নয়; তারা যে পরস্পরের পরিপূরক তাও বলা যাবে না; পাঠাগার বিদ্যালয়ের সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু এটাও তো সত্য যে পাঠাগার না থাকলে বিদ্যালয়ের চলে না, যদিও বিদ্যালয় ছাড়াও পাঠাগার চলতে পারে।

পাঠাগার তাই নিজের পায়েই দাঁড়াতে সক্ষম। কিন্তু এখন, চতুর্দিকে যখন উন্নতির মহা হইচই, অবিরাম ত্রস্তব্যস্ততা, তখন পাঠাগারের দশাটা বেশ নড়বড়ে। মূল কারণ জ্ঞানের দামটা এখন কমেছে। সভ্যতার যে অগ্রগতি সেটা কি জ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রয়োগ ভিন্ন সম্ভব ছিল? জ্ঞান এসেছে অভিজ্ঞতা থেকে, এসেছে পূর্ববর্তীদের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও বিচার করে। জ্ঞান বোঝা নয়, জ্ঞান পাথেয়। তেমন পাথেয় যা আনন্দ দেয় সৃষ্টির, মুক্তি দেয় চেনা জগতের চেয়ে অনেক বড় এক জগতে, যুক্ত করে বহু মানুষের সঙ্গে–কাছের, দূরের, জীবিত ও মৃত। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্ষা করে ও বিকশিত করে মানুষের মনুষ্যত্বকে।

এখন তো দেখা যাচ্ছে মানুষের এই মনুষ্যত্বটাই বিপদগ্রস্ত। আক্রমণটা আসছে নানান দিক থেকে। খুব ভালোভাবেই আসছে এই ধারণার প্রচার থেকে যে জ্ঞানের চর্চার এখন আর আলাদা করে দরকার নেই, প্রযুক্তি জ্ঞানকে এনে দিয়েছে আমাদের ঘরের ভেতরেই। বোতাম টেপা পর্যন্ত অপেক্ষা, তার পরেই চলে আসবে ঝরঝর গড়গড় করে। অনুশীলনের আবশ্যকতা নেই, দরকার নেই মাথা ঘামানোর কিংবা হৃদয় দিয়ে বুঝবার।

এই যান্ত্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও আলস্য মনুষ্যত্ববিরোধী। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চাই। চর্চা চাই আনন্দের, মুক্তির আকাঙ্ক্ষার, সৃজনশীলতার। আর দাঁড়াবার একটা উপায় হচ্ছে পাঠাগার

গড়ে তোলা। নতুন নতুন পাঠাগার চাই, চাই পুরাতন পাঠাগারকে সজীব করা।

কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব হবে? উপায়টা কী? উপায় রয়েছে পাঠাগারকে কেবল পাঠাগার না রেখে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ভেতরে। পাঠাগারে বই থাকবে, অবশ্যই। কিন্তু বইগুলো মৃত কিংবা অর্ধমৃত অবস্থায় থাকবে না। তারা প্রাণবন্ত রইবে; পাঠক পড়বে, কেবল পড়বে না রীতিমতো হৃদয়ঙ্গম ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে নেবে। পাঠাগারে বইয়ের আদান-প্রদান ঘটবে। কোন বইয়ে কী আছে, কোথায় কোন নতুন বই পাওয়া যাবে, পুরাতন বই অপেক্ষা করছে পঠন ও আলাপনের জন্য, এসব নিয়ে কথাবার্তা চলবে।

পাঠাগারকে কেন্দ্র করে আলোচনাসভা হবে, আয়োজন করা হবে নানা ধরনের প্রদর্শনীর ও বক্তৃতার, ব্যবস্থা থাকবে গানের, নাট্যাভিনয়ের। উদযাপন চলবে বিশেষ বিশেষ দিবসের। প্রতিযোগিতা চলবে নানা রকমের। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীও বাদ থাকবে না। এমনকি দেয়ালপত্রিকাও প্রকাশ করা যেতে পারে। মুদ্রিত পত্রিকা তো আরও ভালো। পাঠাগারের সামনে যদি খোলা জায়গা থাকে তবে সেখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা করাটাও অসম্ভব হবে না।

বিকেল হলে মানুষ রওনা হবে পাঠাগারের দিকে। আসলে পাঠাগার তো একটা সংস্কৃতিকেন্দ্রই হবে। আসবে শিক্ষার্থী, আসবেন শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী। অবসরভোগী মানুষেরা আসবেন। মেয়েরাও আসবে। সন্ধ্যা হলে সর্বত্র এখন যে বিষণ্নতাটা নেমে আসে, দেখা দেয় ছোটো ছোটো ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব যন্ত্রপাতি দিয়ে বিনোদন খোঁজার অসুস্থ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন তৎপরতা সেটা আর ঘটবে না। মানুষ সামাজিক হয়ে উঠবে। আর এটা তো কোনো একটা পাঠাগারের ব্যাপার হবে না, ব্যাপার হবে সকল পাঠাগারেরই, পাড়ায় মহল্লায় সমস্ত দেশ জুড়ে। সব মিলিয়ে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটার সম্ভাবনা।

সংস্কৃতির এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃতি আসলে সভ্যতার চাইতেও স্থায়ী। তাই দেখা যায় সভ্যতার পতনের পরও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান টিকে যায়। সংস্কৃতির ভেতর জ্ঞানও থাকে। এবং সংস্কৃতিতে খুব ভালোভাবে যেটা থাকে তা হলো সামাজিকতা। অত্যন্ত আবশ্যক এই যে সংস্কৃতি তা আদান-প্রদান ও মেলামেশার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়।

সাংস্কৃতিক কাজ আসলে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করারই কাজ। সেজন্য তাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। এই যে মানুষ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে পড়ছে, হিংগ্রতা ও ভোগবাদিতা একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, এর কারণ সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা নেই। ওদিকে বিকৃতির আক্রমণ কিন্তু ঠিকই চলছে। আসছে তা ইন্টারনেট, ফেসবুক ও মুঠোফোনের মাধ্যমে; আসছে ধর্মীয় ওয়াজের আবরণের ভেতর দিয়েও।

পাঠাগারগুলোকে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র করা গেলে এলাকার মানুষ জানবে বিকেলে ও সন্ধ্যায়

কোথায় যেতে হবে। সেখানে যাবে, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে, আনন্দ পাবে, এবং রক্ষা পাবে বিবরবাসী করবার যে-চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে তার হাত থেকে।

কিন্তু কারা করবে এই কাজ? করবে তারাই যারা মনে করে পরিবর্তন দরকার, পরিবর্তন সম্ভব এবং পরিবর্তন না ঘটলে অন্ধকার আরও বাড়বে, এবং আমরা আরও তলিয়ে যেতে থাকব। এরকমের হৃদয়বান মানুষ সমাজে অনেক আছেন। তাঁদেরই কর্তব্য এই কাজে সংঘবদ্ধ হওয়া।

যা বলছিলাম, এইরকম একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টির জন্য পাঠাগার অত্যন্ত উপযোগী। কারণ পাঠাগারে একটি জায়গা পাওয়া যাবে, তার আশেপাশে খোলা পরিসর পাওয়া যেতে পারে–ভবনে যেমন তেমনি ভবনের বাইরেও। সাংস্কৃতিক কাজটা কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন হবে না। উদ্দেশ্য হবে অবস্থাকে বদলানোর; পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যের বিপরীতে নতুন এক সামাজিকতা সৃষ্টি করার। সামাজিক না হলে আমাদের মনুষ্যত্ব যে রক্ষা পাবে না এ নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই।

ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়